7

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 29 APR 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৭

উচ্চ শিক্ষার কাঠামো পুনর্বিন্যাস

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

অবিভক্ত বাংলাদেশে, উচ্চ শিক্ষার ইতিহাসে, একদিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন তিনি উপাচার্য এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, সেই সময়ে তিনি এক যুগান্তকারী ব্যবস্থায় সকল স্নাতকোত্তর শিক্ষা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীভূত করেন (১৯১৭)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগ গঠন করে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন বিভাগটিকে দেশের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার একক শক্তিশালী কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে।

স্যার আশুতোষের এ ব্যবস্থায় প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি কলেজ— বিশেষতঃ কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতার বাইরে ঢাকা কলেজ, রাজশাহী কলেজ ও সিলেটে মুরারীচাঁদ কলেজ তাদের দীর্ঘকালের স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত হ'ল। স্যার আশুতোষের উদ্যোগ বিনা বিতর্কে গৃহীত হয়নি। উল্লিখিত কলেজগুলির একটি সুখ্যাতি গড়ে উঠেছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে। স্যার আশুতোষের ব্যবস্থা অনেকটা ঝড়গাঘাতের মতো নেমে এসেছিল দীর্ঘকালের ঐতিহ্যমণ্ডিত এই কলেজগুলির উপর। এতে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার সমসাময়িক সাক্ষ্য-প্রমাণের বাইরে, আমাদের সময়ে একটি প্রমাণ মিলবে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর আত্মজীবনীমূলক বই তে হিনো দিবসাঃ-য়।

কলকাতায় দু'বৎসর মেয়াদী মাস্টার্স কোর্স চালু ছিল আগে থেকেই, তফাতের মধ্যে এই কোর্সের পরিচালনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজ রইল না। প্রথম শ্রেণীর বেশ কয়েকটি কলেজে দু'বৎসর মেয়াদী পাস কোর্সের পাশাপাশি সমমেয়াদী ডিগ্রী অনার্স কোর্স চালু রইল।

১৯৪৭ সালে, স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের বৎসরে, পূর্ব বাংলায় এ ধরনের কয়েকটি কলেজ আমরা পেয়েছিলাম। এই তালিকায় সর্বাগ্রে ছিল রাজশাহী কলেজ। এর বাইরে ছিল রংপুরে কারমাইকেল কলেজ, কুমিল্লায় ভিকটোরিয়া কলেজ, দৌলতপুরে (খুলনা) ব্রজলাল কলেজ, পাবনায় এডওয়ার্ড কলেজ। আরও দু'একটি কলেজ দু'একটি বিষয়ে অনার্স পর্যায়ে শিক্ষাদানের অনুমতি পেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় আমরা উচ্চ শিক্ষার কাঠামোগত একটি সমস্যার সম্মুখীন হলাম। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুরু থেকেই কলকাতা থেকে ভিন্নধর্মী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় ছিল তিন বৎসর মেয়াদী অনার্স ও এক বৎসর মেয়াদী মাস্টার্স কোর্স। ডিগ্রী কোর্সের ভর্তির যোগ্যতার প্রশ্নে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য কোন পার্থক্য ছিল না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বারো বৎসর মেয়াদী শিক্ষা ছিল উভয় ক্ষেত্রেই ভর্তির যোগ্যতা। ঢাকার নিবাস ব্যবস্থা এতদিন ঢাকা শহরের সীমানায় কার্যকর ছিল। তাই পূর্ব বাংলায় সবগুলি কলেজ অনুসরণ করে চলেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ঃ দুই বৎসরের পাস (Pass) অনার্স (Honours) কোর্স। স্বাধীনতার পরও বেশ কয়েক বছর এ ব্যবস্থাই চালু রইল। এমনকি ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় দ্বিতীয় প্রদেশের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল রাজশাহীতে, সেখানেও অনুসৃত হ'ল কলকাতার ব্যবস্থা।

আশুতোষের লক্ষ্য ছিল পোস্ট গ্রাজুয়েট-কে শক্তিশালী করা। ঢাকার লক্ষ্য ছিল অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদলে, তিন বৎসরের অনার্স-কে শক্তিশালী করা। ঢাকায় ১ বছরের মাস্টার্সের কোন স্বতন্ত্র চরিত্র ছিল না। মাস্টার্স নামে যে চলছিল তাকে অনার্সের তিন চক্করের দৌড়ের পর চতুর্থ চক্কর বলা যেত। অন্যকথায়, ঢাকার মাস্টার্স নামেই আলাদা বস্তুতে বা মানের বিচারে নয়। এখানেই ছিল কলকাতার মাস্টার্সের সঙ্গে ঢাকার স্নাতকোত্তরের গুণগত পার্থক্য।

মূলকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রীর গ্রাহ্যতা বেড়ে গিয়েছিল পাস ডিগ্রীধারীদের জন্য এর দ্বার পথ উন্মুক্ত রাখায়. দু'বৎসরের পাস ডিগ্রী নিয়ে, এক বৎসর মাস্টার্স প্রিভিয়াস (Masters ous) করে, যারা মাস্টার্স দ্বিতীয় ভাগে অনার্স দের সঙ্গে মিলিত হ'ত, তারা যে সম-যোগ্যতা নিয়ে তা তা বলাই বাহুল্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু থেকেই মাস্টার্স ডিগ্রী ছিল সকল সকল যোগ্যতার ডিগ্রীধারীর জন্য অবারিতদ্বার।

য় দেখা মেলে এ ব্যাপারে ভিন্ন চিন্তার। মানের প্রশ্নে র উন্নাসিকতার প্রমাণ মেলে দু'বৎসরের অনার্স স্তরেও। এমন ছিল যে, অনার্সে ভর্তি হওয়ার পরও অনার্সের রণে অযোগ্য প্রমাণিত হলে ছাত্রকে পাস কোর্সে করা সহজ ছিল। কোর্স, কাঠামোর মধ্যেই সে ব্যবস্থা ছিল।

উত্তর পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যে উচ্চ শিক্ষার কাঠামো টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে বিশেষতঃ এ-জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই দায়িত্ব অর্পিত হয় প্রদেশের লেজের অধিভুক্তির—affiliation-এর। এই য়িত্ব পালনে ঢাকার কোন প্রস্তুতি ছিল না: তাছাড়া এ ক্ষেত্রে যে মৌলিক প্রশ্নটির মীমাংসা জরুরী ছিল, কাঠামোর প্রশ্ন, সেখানেও প্রশ্নটিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি। ত'বে এ বিষয়ে ঐ সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের কার্যবিবরণী পাঠ না করে কোনরূপ মন্তব্য করা ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ প্রদেশের সম্পূর্ণ উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢালাওভাবে ঢাকার কাঠামোয় নিয়ে আসার ভালো-মন্দ বিবেচনার উপযুক্ত জায়গা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল। বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারত, একটি বিশেষ কমিটি পর্যায়ে প্রশ্নটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনা। আমার জানা মতে এমন কিছুই ঘটেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কি চিন্তা হয়েছিল আমার জানা না থাকলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল (১৯৫৮) ও যার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালে, কাঠামোর প্রশ্নে সেই কমিশন একটা প্রস্তাব রেখেছিল ঃ পাস ও অনার্স উভয় ক্ষেত্রেই ৩ বৎসর মেয়াদী কোর্স। মাস্টার্স কোর্স হবে ২ বৎসর মেয়াদী। [কমিশন রিপোর্টের ১ম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩৪, ৩৫, ৩৬ দ্রষ্টব্য।]

শরীফ কমিশনের প্রস্তাবটি নিছক উচ্চ শিক্ষা সঙ্কোচনের চিন্তা-প্রসূত ছিল না। তার প্রমাণ মেলে যখন দেখা যায় যে বর্তমানে ভারতে ওই প্রস্তাব ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। ৩+২=৫ বৎসরের উচ্চ শিক্ষা কাঠামো প্রতিবেশী ভারতে গৃহীত হওয়ার পর এ দেশেও এর অনুকূলে একটা মত ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। তবে পাস ও অনার্স দু'টি পৃথক ধারার যৌক্তিকতা বিষয়ে দু'টি মত চালু আছে! যাঁরা একটি অভিন্ন ধারার পক্ষে এবং ফলাফলের ওপর অনার্স প্রদানের পক্ষে, তাঁরা সম্ভবতঃ দুটি ধারার গঠনে যে মৌলিক পার্থক্য সেটা ভুলে যান। পাস ডিগ্রীতে সচরাচর সমান গুরুত্ব দিয়ে ৩টি বিষয় পড়তে হয় এবং স্বভাবতই বিষয়গুলি গভীরতায় একটি নির্দিষ্ট মানের হয়ে থাকে! অনার্সে একটি বিষয়ের প্রাধান্য থাকে এবং এর লক্ষ্য গভীরতায় পাস ডিগ্রীর গ্রাজুয়েটের চাকুরীগত যোগ্যতা ব্যাপক। তুলনায় অনার্স ডিগ্রীর গ্রাজুয়েটের দৃষ্টি থাকে উচ্চতর মাস্টার্স ডিগ্রীর দিকে। তার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষকতা বা উচ্চতর পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী চাকুরী পাস ডিগ্রীকে একটি প্রান্তিক ডিগ্রীও ধরা যায়, নিম্নতর পর্যায়ে এসএসসি'র মতো। অনার্স ডিগ্রীর মধ্যে এই সীমাবদ্ধতা নেই। এই দিক দিয়ে বিচার করলে স্থায়িত্বে দু'টি কোর্স ৩ বৎসর মেয়াদী হলেও চারিত্রিক বৈশিষ্টে এরা পৃথক।

পাস কোর্স সম্বন্ধে গভীর বিবেচনার প্রয়োজন আছে। দেশের বহুসংখ্যক কলেজের বিশেষতঃ বেসরকারী কলেজের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে পাস কোর্স।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী পর্যায়ে পাস কোর্সকেই ডিগ্রী শিক্ষার মূলধারা বিবেচনা করা হয়েছিল, একই সঙ্গে প্রথম থেকেই এই ধারার ডিগ্রীর মূল্য, বাজার মূল্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে শুরু করে ডিগ্রী পাস— এই সাধারণ ব্যবস্থায় শিক্ষার নিম্নমান ছিল আলোচনার বিষয়। উদ্বেগের আরও একটি কারণ ছিল। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাসমূহে ব্যাপক অসাফল্য। পরীক্ষার ফলাফলের ধারাবাহিকতায় ডিগ্রী পাস পর্যায়ে ফেলের হার শতকরা ৬০ থেকে ৮০-র মধ্যে। এর পাশাপাশি ডিগ্রী অনার্স পরীক্ষায় পাসের হার শতকরা ৮০ থেকে ১০০-র মধ্যে। অনার্স পরীক্ষায় আছে সাফল্যের নিশ্চয়তা, আর পাস পরীক্ষায় সাফল্যের অনিশ্চয়তা। ডিগ্রী পাস ধারা এভাবেই এক ভয়াবহ অপচয়ের ছবি তুলে ধরে।

কারণ হিসেবে বলা যায়, এক—উচ্চ মাধ্যমিকে যারা ভাল ফল করে, তারাই অনার্স কোর্সে ভর্তির সুযোগ লাভ করে। যাদের ফল ভাল নয়, পাস কোর্স তাদের জন্য। সুতরাং মেধাবী ছাত্ররা অনার্স পরীক্ষায় যে ফল দেখাতে পারে, নিম্নযোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্ররা পাস পরীক্ষায় তা পারে না। দুই—পাস কোর্সের ছাত্ররা অধিকাংশ দেশের গড়পড়তা মানের কলেজের ছাত্র। এসব কলেজের মান নিম্ন পর্যায়ের। ন্যূনতম সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে পরিচালিত এসব কলেজ। বিশেষতঃ বেসরকারী কলেজগুলিতে এবং সংখ্যায় এরাই বেশী—ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত মানসম্মত শিক্ষার প্রতিকূল পরিস্থিতি তুলে ধরে। তাছাড়া শিক্ষকেরাও তাঁদের নিম্নবেতনের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে প্রাইভেট টিউশনি থেকে শুরু করে অন্য যে কোন অর্থকরী কাজ করে থাকেন, করতে বাধ্য হন। শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের মান স্বভাবতই নীচু, অনাকর্ষণীয়। অধিকাংশ কলেজে লাইব্রেরী থাকলেও সেখানে বইয়ের শূন্যতাই চোখে পড়বে। বাজেটে গ্রন্থখাতে বরাদ্দ না থাকাই নিয়ম। ল্যাবরেটরীর অবস্থাও মানসম্মত নয়। কারণ একই— অর্থাভাব। কলেজের চার দেয়ালের মধ্যে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ, উভয় ক্ষেত্রেই মানগত ও পরিমাণগত বিচারে, ঘাটতির দিকটাই চোখে পড়ে। এই স্তরে ছাত্রদের অবলম্বন বাজার-চলতি নোট-বই, যা বিকোয় পাঠ্যপুস্তক নামে. এ-সব নোট-বইয়ের একটা বড়ো অংশ আবার কলেজের শিক্ষকদেরই রচনা এবং কলেজের ছাত্ররা এসব বইয়ের সংরক্ষিত বাজার। সহজে, সম্ভব হলে অসাধু পথে, পরীক্ষা পাসের পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ডে এক আশ্চর্যজনক ছাত্র-শিক্ষক সহযোগিতার কথা না বললে পাস কোর্স সম্বন্ধে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না।

অস্বীকার করা যায় না, সমান্তরাল অনার্স ধারা বিদ্যমান থাকায় পাস ডিগ্রীর অবমূল্যায়ন আরও তীব্র রূপ ধারণ করেছে। তিন বৎসরের বিপরীতে দুই বৎসরের ন্যূনতা এই অবমূল্যায়নের ভিত্তি রচনা করেছে এবং এরই প্রতিকার হিসাবে এবং আরও কিছু বিবেচনায় শরীফ কমিশন অনার্সের সমমেয়াদী, তিন বৎসরের পাস ডিগ্রীর প্রস্তাব করেছিল।

পাকিস্তানের সামরিক শাসনের সময়ের প্রস্তাব তখন দেশে, বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র বিরূপতার সম্মুখীন হয়। ভিন্নতর রাজনৈতিক পরিবেশ, চারটি দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর, এখন প্রস্তাবটিকে তার যথার্থ মূল্যে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে। প্রস্তাবটিকে শুধু অনুত্তেজিত মনে বিবেচনা নয়, গ্রহণ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্বতন্ত্র চরিত্র নিয়েই পাস ডিগ্রী থাকতে পারে। এর পক্ষে অনেক যুক্তির মধ্যে একটি হলো দেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় যে বিস্তর সংখ্যায় শিক্ষকের প্রয়োজন সেই প্রয়োজন মিটাতে পারে কেবল অধিকতর সংখ্যায় পাস ডিগ্রীধারী গ্রাজুয়েট। দীর্ঘকাল আমাদের প্রচলিত পাস ডিগ্রীধারীরাই এ প্রয়োজন মিটিয়ে এসেছে।

এরপর আমি একটি বিকল্প প্রস্তাব করতে চাই বিবেচনার জন্য। আমাদের উচ্চ শিক্ষায় আগে থেকেই সাধারণ ধারার পাশাপাশি আছে একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ধারা। দেশের মেডিক্যাল, ইনজিনিয়ারিং ও কৃষি বিষয়ক ডিগ্রী কোর্স ৪ থেকে ক্ষেত্র বিশেষে পাঁচ বৎসর মেয়াদী কিছুদিন থেকে সাধারণ শিক্ষায় ৪ বৎসর মেয়াদী প্রথম ডিগ্রী সীমিতভাবে হলেও প্রচলিত হয়েছে। এ ধারার প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা করছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। তবে ইতিমধ্যেই এর প্রভাব পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়েও।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরেই কাঠামো-পুনর্বিন্যাস চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে মানোন্নয়নের চিন্তা এবং সেই চিন্তা নিয়ে যাবে কারিক্যুলাম বিষয়ক চিন্তায় ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ চিন্তায়। উচ্চ শিক্ষায় আজো তক শিক্ষক প্রশিক্ষণ চিন্তা গুরুত্বের সঙ্গে করা হয়নি। যদিও Staff development এখন পৃথিবীর সর্বত্র একটি বহুল আলোচিত প্রসঙ্গ। এ-দেশে উচ্চ শিক্ষা জগতে শিক্ষকদের মধ্যে এ এক বিরস প্রসঙ্গ। অনেকের দৃষ্টিতে মানহানিকর। ঠিক যেমন ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষকদের মূল্যায়ন অধিকাংশের কাছে মানহানিকর। এই নেতিবাচক, আত্মপরায়ণ ও আত্মরক্ষামূলক চিন্তাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে উচ্চ শিক্ষার মান কোন দিন ঈপ্সিত মাত্রায় পৌঁছবে না।

আমাদের প্রথম ডিগ্রী যেহেতু তিন বৎসর মেয়াদী তাই বিদেশের প্রথম ডিগ্রীর সমতুল্যতা (equivalence) পায় না। ওদের ৪ বৎসর মেয়াদী এমনকি বিলেতের ৩ বৎসর মেয়াদী ডিগ্রীর সমতুল্যতা দাবী করে আমাদের ৪ বৎসর, অর্থাৎ মাস্টার্স ডিগ্রী। এ-দেশে বিগত বৎসরগুলিতে যে ক্রমেই চার বৎসরের প্রথম ডিগ্রী গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদি এ গ্রহণযোগ্যতা থেকে জন্ম নেয় ব্যাপকভাবে জাতীয় পর্যায়ে চার বৎসরের ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন, তাহলে তার প্রভাব পড়বে আমাদের অধিকাংশ কলেজের উপর।

এমন পরিস্থিতির উদ্ভব অদূর ভবিষ্যতে না হলেও অনতিদূর ভবিষ্যতে হবে না, জোর করে বলা যায় না।

এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে ও বাস্তব পরিস্থিতির বিবেচনায় এখনই আমাদের প্রচলিত দু'বৎসর মেয়াদী, তিন বিষয় ভিত্তিক, অধিকাংশ কলেজের মূল অবলম্বন (Main stay) পাস কোর্সের বিলুপ্তি কাম্য নয়। বিশেষতঃ এ-জন্য নয় যে, ভবিষ্যতের চার বৎসর মেয়াদী প্রথম ডিগ্রীর কাঠামোয় প্রচলিত দুই বৎসরের ডিগ্রীকে অনায়াসে জায়গা করে দেয়া যাবে। এখানে আমার চিন্তা আমেরিকার কাঠামোর অনুরূপ। সে দেশে কম্যুনিটি কলেজে একজন ডিগ্রীর প্রথম দুই বৎসরের পাঠ নিয়ে পরে উপযুক্ত সময়ে তার ক্রেডিট ব্যবহার করে চার বৎসরের কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।